সেলিম রেজা নিউটন

এই নিপাট নিঃশব্দ সুন্দর উন্নয়নশীল একনায়কত্বের মধ্যে

Artwork: Michael Hutter

ঘোষক: ‘স্নান’-এর ১০ম বর্ষযাপনে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ। সময় ও অস্তিত্বের ভারবাহী অশ্বত্থের শেকড় এগিয়েছে সবার অগোচরে। জীবনচেতনা, জীবনের রস, রসিকতা, জীবনজিজ্ঞাসা— এই নিয়ে নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে আমরা সারা দিন সকল প্রকার নতুনেরে ডাকি। স্নান-এর এ আলোকের উৎসবে আপনারা সকলে সবান্ধব আমন্ত্রিত।

কিসের তাড়নায় আমরা উত্তাল সাগরে ডিঙ্গা ভাসাব? কোন তাড়নায় আমরা স্নানে ভাসাই ভেলা? কেন আমরা ছোটকাগজ করি, হাতে কলম তুলে নিই? কিসের তাড়নায়? এই তাড়নার বিষয়গুলো নিয়ে এবার “ছোটকাগজ কথন” উপস্থাপন করবেন কথক সেলিম রেজা নিউটন।

সেলিম রেজা নিউটন: আপনাদের ছোটকাগজ ‘স্নান’-এর এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর যে-উপলক্ষ আপনারা তৈরী করেছেন এবং নানাভাবে শ্রম এবং আরও বিভিন্ন রকমের বিনিয়োগ করে সারা দিন

ধরে—এবং এই দিনের আগে নিশ্চয়ই আরও অনেক দিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন—আপনাদের সবাইকে এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই।

আমি অনেক অস্বস্তি নিয়েই এখানে দাঁড়িয়েছি। অনুষ্ঠান, মঞ্চ, মাইক, আনুষ্ঠানিকতা— এগুলোর সঙ্গে আমার এক ধরনের বিচ্ছেদই ঘটে গেছে অনেক কাল ধরে। আমি যদি খুব বেশি ভুল না করে থাকি, আমাদের এই ক্যাম্পাসে এর আগে, আজকের আগে, সর্বশেষ এরকম কোনো একটা অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি, সেটা সম্ভবত ২০১৩-১৪ সালে। এবং সম্ভবত আপনাদের এই চিহ্নের প্রধান—চিহ্ন-প্রধান—প্রফেসর শহীদ ইকবাল তখন একটা হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ শিক্ষক হবিবর রহমান স্যারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আমার লিখিত প্রবন্ধ পড়ার কথা ছিল। বিষয়টা আমার জন্য আগ্রহের ছিল। এবং প্রবন্ধ পুস্তকে পরিণত হয়েছিল। সেটাই ছিল শেষ, এই ক্যাম্পাসে, আমার কথা বলা— এরকম কোনো অনুষ্ঠানে।

[আজকের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও] আমি নির্দ্বিধায় 'না' করে দিতাম। রাজি হতাম না। আমার রাজি হওয়াতে না-হওয়াতে আপনাদের কিছু যেত-আসতোও না। এ ধরনের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো মানুষের অভাব নাই। এবং সেখানে নির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তিকেই লাগবে এমন কোনো প্রয়োজনও আসলে নাই। এটা একটা শূন্যস্থান, যে-শূন্যস্থান যেকোনো মানুষকে দিয়েই পূরণ করা যায়। নির্দিষ্ট কিছু তকমা বা স্টেটাস বা পরিচিতি—বাজারমূল্য—থাকলেই তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়। যেহেতু এটা 'চিহ্ন' নামক প্রতিষ্ঠানের তরফে আহ্বান ছিল, যেহেতু এর পিছনে প্রফেসর শহীদ ইকবালের ভূমিকা আছে বলে আমি ধরে নিয়েছি, সে কারণেই আমি রাজি হয়েছি এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

আমরা খুব আজগুবি একটা রাষ্ট্রীয় প্রণালীর মধ্যে জীবনযাপন করছি। এখানে আজব আজব ঘটনা আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এবং কত আজবভাবে কত আজব ব্যাপারকে কতটা স্বাভাবিক করে নিয়ে দিনযাপন করা যায়, আমরা সেই অভিনয় প্রতিদিন করে চলেছি— অজস্র মানুষ। এরকমই একটা আজব ঘটনার মুখোমুখি আমরা হয়েছিলাম মাত্র কিছু দিন আগেই আমাদের এ দেশের একটা ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেলে (আমি খুব—কী বলব যে—'ভদ্রতা' বজায় না-রেখে কথা বলার চেষ্টা করছি), একটা ন্যাশনাল টেলিভিশনে চ্যানেলে খবর প্রচারিত হয় মহাসমারোহে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটনসহ আরো অনেকে ইয়াবা-ব্যবসায়ে জড়িত। এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে বিশেষ ইয়াবা-চক্রটি আছে তার তালিকা পুলিশ—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়—গোয়েন্দা-সূত্রে দাঁড় করিয়েছে। খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বানানো তালিকা অনুসারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়াবা-চক্রের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছি আমি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনেক শিক্ষক, কর্মচারি, শিক্ষার্থী— ঐ তালিকায় তাঁদের নাম আছে, এরকমটা আমাদের জানানো হয়। ইয়াবা-সাংবাদিক দৌড়াদৌড়ি করেন। নানান জায়গায় যান। একটা সুন্দর 'ব্রেকিং নিউজ' যেন তিনি দাঁড় করাতে পারেন সে চেষ্টা করেন। এবং তারই অংশ হিসেবে প্রফেসর শহীদ ইকবালের কাছেও এই সাংবাদিক মহোদয় যান। প্রফেসর শহীদ ইকবাল—ক্যামেরায় আমরা যেটুকু দেখেছি, যেটুকু সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, আমরা দেখেছি, আমাদের কাছে ভিডিও ক্লিপ আছে এখনও— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি ইয়াবা এবং মাদকের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে তাঁদের [বিরুদ্ধে] কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এটা যে অনৈতিক, এটা যে খারাপ, এটা যে নিন্দনীয়, এটা যে ভর্ৎসনাযোগ্য, এই মর্মে ইয়াবা-সাংবাদিকের সঙ্গে বলতে গেলে একই সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন। আমি জানি না সেই সাংবাদিক

তাঁকে এ তালিকাতে কারা কারা আছেন বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়াবা-চক্রের প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ আমার নামটাও বলেছিলেন কিনা। এ ছাড়া ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর আবুল কাশেম— তাঁর কাছেও সাংবাদিক যান এবং তিনিও 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইয়াবা-সাংবাদিকতা জিন্দাবাদ' ধরনের বক্তব্য পেশ করেন। শিক্ষকদের যে আসলে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় হয়েছে, এধরনের সুরই সেখানে ছিল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—যাঁকে আমি 'বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর 'বাদশাহ' বলি, যাঁর প্রাসাদ আমাদের সামনে অবস্থিত—এই মুহূর্তে তাঁর প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি—এটা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি না, বাদশাহের একটা পদ আছে আমাদের এখানে, আমি সেদিকে আসব একটু পরে—তাঁর কাছেও সাংবাদিক যান। এবং তিনি বলেন যে, আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব এ সমস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে।

এখন এ ঘটনার দু-তিন মাস, চার মাস, গেল বোধ হয় আমার ঠিক মনে নাই, তারপরে আবার প্রফেসর শহীদ ইকবালের তরফেই বলতে গেলে আহ্বান যে, ছোটকাগজ নিয়ে কথা বলতে হবে। ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং ইকবাল না। ইকবাল আমার অনেক পুরানো বন্ধু এবং আমার অনুজ বন্ধু। আমি এখানে [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে] যখন জয়েন করি ইকবাল তখনও বাংলা বিভাগের ছাত্র। তখন প্রফেসর জুলফিকার মতিনের কাছাকাছি থেকে তিনি পিএইচডির কাজ করছিলেন। আমরা দীর্ঘদিন এ ক্যাম্পাসে এক সঙ্গে আছি। পরস্পর পরস্পরকে জানি। কী হয়? যখন আমাদের মনে হয় যে, বাতাস কোনো বিশেষ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তখন কি আমরা এক ধরনের ভূমিকা পালন করি? এবং যখন আমাদের মনে হয় বাতাস অন্য দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তখন আমরা অন্য ধরনের ভূমিকা পালন করি?

প্রশ্নটা ইকবালকে নিয়ে নয়। এখানেও একটা শূন্যস্থান আছে।

এবং শূন্যস্থানে যেকোনো কারোরই প্রায় নাম বসিয়ে দেওয়া যায়। এবং আমি বাকি দু-জনের নামও বলেছি। সাংবাদিক মহোদয় আর কারো কাছে গেলেও হয়ত একই ধরনের 'নিউজ বাইট'—সংবাদের কামড়ানি—সেটা পেতেন—হয়ত। 'বাইট' মানে আপনারা সবাই জানেন এখন। টেলিভিশনে— তিন-চার কথায় একটা কামড়ে দেওয়া।

আমরা ছোটকাগজ করি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে। আমরা মঙ্গলগ্রহের ফাঁকা, বায়ুশূন্য, স্থানে দাঁড়িয়ে ছোটকাগজ করি না। আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে। একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে কাজ করার সুবিধা হচ্ছে এই যে, খুব সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এটা ছোট জায়গা। সবাই সবাইকে চেনে। এখানে কাজ করার অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সবই দেখা যায়। কে কী করছেন আমরা সবাই সেটা দেখতে পারি। জানতে পারি। বুঝতে পারি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়—আমি নির্দিষ্ট করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলি আপাতত—এটা কোনো নিরপেক্ষ, নিউট্রাল কোনো জায়গা না। হাওয়ার্ড জিন বলতেন যে, ইউ ক্যান্ট্ বি নিউট্রাল অন এ রানিং [মুভিং] ট্রেন[১]। এটা একটা রানিং ট্রেন। এখানে আমরা চাইলেও স্থির থাকতে পারি না। এটা নড়ে। এটা মুভ করতে থাকে। এই ট্রেনের ইঞ্জিন এই সামনের [উপাচার্যের বাসভবনের দিকে ইঙ্গিত করে] বাদশাহী প্রাসাদে অবস্থিত। যখন যে ব্যক্তি এই প্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করেন, তিনি হয়ে ওঠেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিন। আমরা এখানে যাঁরা শিক্ষকেরা আছি, আমরা যাঁরা কর্মচারীরা আছি, আমরা বেতন পাই সম্ভবত এই ইঞ্জিনের পেছনে বগি হিসেবে চলাফেরা করার জন্য। যত দিন যাচ্ছে, আমাদের

---

[১] Howard Zinn, *You Can't Be Neutral on a Moving Train: A Personal History of Our Times*, Beacon Press; First Printing edition (September 5, 2002)

শিক্ষার্থীরাও তাঁদের নিজের নিজের ইঞ্জিন নির্ধারণ করছেন, এবং সেই সেই ইঞ্জিনের পেছনে বগি হিসেবে হাঁটছেন। আমি এরকমই দেখতে পাই। আমার চোখে ঝাপসা লাগে। আমি খুব বেশি দেখতে চাই না আর। খুব বেশি এই ক্যাম্পাসে হাঁটতেও চাই না।

নালিশ করার জন্য আমি এখানে আসি নি। আজকে ২৭শে মার্চ— আপনারা বলছিলেন মুক্তিযুদ্ধ স্মরণ করছেন। মুক্তিযুদ্ধ এরকম কোনো 'অনুষ্ঠান' ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে কোনো নির্ধারিত আলোচক এসে বক্তৃতা করেন নি। সামনে দাঁড়িয়ে অন্যরা শোনেন নি। মুক্তিযুদ্ধের মতো মুহূর্তগুলো আগে থেকে ক্যালেন্ডারের তারিখ ঠিক করে আসে না। এগুলো আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি করা অনুষ্ঠানের মতো না। কিন্তু আমাদের দেশে যতদিন যাচ্ছে আমরা 'অনুষ্ঠান' দেখতে পাচ্ছি— 'অনুষ্ঠান'। এখানে প্রফেসর রেজাউল করিম সিদ্দীক [আরকেএস]-এর ছবি আমাদের সামনে দাঁড়ানো। তাঁর মৃত্যুর পরে আমরা সর্বশেষ দেখেছি কীভাবে মৃত্যু 'পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানমালা'য় পরিণত হয়। আমরা এখন জানি যে, আমাদের মধ্যেই কাউকে মেরে ফেলা হলে আমরা পরের দিন এবং ঐদিন কী কী অনুষ্ঠানে লিপ্ত হবো।[২]

ছোটকাগজ করাটা অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলার বিষয় না। কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হওয়া কতগুলো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয় না। 'অনুষ্ঠান' বলতে আমি ক্লাসরুমে শিক্ষকের লেকচারিং থেকে শুরু করে পরীক্ষা, নাম-ডাকা, হাজিরা, ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট ম্যাম থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট নেওয়া এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডকেই বুঝাচ্ছি। যখন কোনো কাজের—আমাদের কাজের—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে, যখন আমাদের কাজ হয় সেখানে শুধু শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করা, তখন সেটাকে আমি বলি 'অনুষ্ঠান'। অনুষ্ঠানে প্রাণ থাকে না।

[২] সেলিম রেজা নিউটন, "রাজশাহীতে খুন হওয়াটা মনে হয় ভিক্টিমদেরই অভ্যাস", *এনটিভি অনলাইন*, ২৪-০৪-২০১৬, archive.is/MAQGP।

অনুষ্ঠানে বাহ্যিক আয়োজন, আড়ম্বর সেগুলোই বেশি থাকে। এগুলোর যে মানুষের জীবনে কোনোই মূল্য নেই, সেটা বলা আমার লক্ষ্য না। কিন্তু এগুলোই যদি আমাদের 'লক্ষ্য' হয়ে যায় তাহলে আর আমরা থাকি না।

এখানে আজকের বাংলাদেশে আমরা যদি দাঁড়িয়ে বলতে না-পারি যে, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ মানুষের অসম্ভব সব রূপকথার মতো কার্যকলাপ, তাঁদের ত্যাগ, লড়াই, সেগুলোকে পার করে আমরা এমন একটা বাংলাদেশ দাঁড় করিয়েছি যেখানে সমস্ত মানুষের মধ্যে একজন মানুষ সবার চাইতে 'বড়' হয়ে উঠেছেন, [তাহলে আমরা 'অনুষ্ঠান' করছি মাত্র]। আমরাই 'বড়' করে তুলেছি। একজন মানুষ অনেক 'বড়' হয়ে উঠবে, সমস্ত জ্ঞান তাঁর, সমস্ত বুদ্ধি তাঁর, সমস্ত মেধা তাঁর, দেশ পরিচালনার সবচাইতে কার্যকর ক্ষমতা-সক্ষমতা তাঁর—এরকম যদি হয়, আর বাকি সমস্ত মানুষের কাজ যদি হয় তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটা, তাহলে সেটা মুক্তিযুদ্ধের পরিণামে দাঁড়ানো একটা দেশের জন্য খুব সম্মানের হয় না। খুব আনন্দের হয় না। আমরা নতুন, গণতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল, একনায়কত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছি। এবং এখানে এটা বাইরে থেকে কেউ বন্দুক নিয়ে এসে আমাদের ঘাড়ের ওপরে চাপিয়ে দেয় নি। এটা আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং ঠিক করেছি আমরা যে, বাংলাদেশের—অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত—সামনের ভবিষ্যৎ এই একনায়কতন্ত্রের অধীনেই চলবে। এবং তাঁর পেছনে আমরা—আরও অনেক ছোট ছোট একনায়কেরা—সারিবদ্ধভাবে হাঁটব। লেফট-রাইট করব। প্যারেড করব। আমাদের পেছনে পেছনে আমজনসাধারণ—ভেড়ার পাল, গরুর পাল—তাঁরা লাইন ধরে হাঁটবেন। আমাদের 'উন্নয়ন' হবে। আমাদের 'গণতন্ত্র' হবে। অনেক প্রাচীন কালে যাদেরকে আমরা শত্রু বলে জেনেছিলাম—সত্যি-সত্যি, সেটা মিথ্যা না, বানানো না—সেই শত্রুদেরকে আমরা মারছি। সেই শত্রুদেরকে আমরা মারতে থাকব। এবং সেই শত্রুদের

নাম করে আমরা যাবতীয় ভিন্নমত দমন করতে থাকব। আমরা প্রয়োজনে কাউকে ইয়াবা-চক্রের প্রধান বানাব, প্রয়োজনে কাউকে 'স্বাধীনতাবিরোধী' বানাব, প্রয়োজনে কাউকে আমাদের মতের বাইরের মতের—খারাপ মতের, অশুভ মতের—লোক বলে প্রতিপন্ন করব। এইভাবে বাংলাদেশ চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাঁড়িয়ে কাজ করার অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এখানকার সংগঠনগুলো—প্রায় সমস্ত সংগঠন—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যের, সিনেমার সংগঠনগুলো—একেকজন ছোট ছোট প্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যে-ব্যবস্থা, যে-কাগজ, যে-পড়াশোনা যে-বিদ্যাবুদ্ধি যে-সুন্দর সুন্দর কথা 'প্রধান' এবং 'অপ্রধান' বলে আমাদেরকে আগে থেকেই ভাগ করে ফেলে, এবং 'অপ্রধান'দের কাজ হয় কোনোভাবে যদি আরেকজন ছোটখাটো 'প্রধান' হয়ে ওঠা যায়, এই পর্যন্ত— তাহলে সেটা আমাদের জন্য আনন্দের হয় না। তাহলে সেটাকে আমরা ছোটকাগজও বলি না, লেখাপড়াও বলি না, স্বরে-অ, স্বরে-আ'ও বলি না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষকেরা—আমরা—যতখানি না 'প্রফেসর', তার চাইতে অনেক বেশি 'প্রশাসক'। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রতীক বলতে প্রশাসন-ভবনটাকে চিনি। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার দেখবেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটবুকগুলো দেখবেন (ডায়েরি, বাৎসরিক ডায়েরিগুলো যেখানে ফোন নাম্বার-টাম্বার থাকে)—দেখবেন—প্রশাসনভবন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তারা, তাঁরাই হচ্ছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই—পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো বটেই।

আমরা একটা প্রশাসনে ভর্তি হয়েছি। এটা হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের যে-আইনে পরিচালিত হয়—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়—সেই আইনে (যেকোনো আইনে যেমন থাকে, আইনের শুরুতেই বলা থাকে যে,

এই আইনে কোন শব্দ দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে—আপনারা ১৯৭৩ সালের ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন’ খুলে দেখবেন, নিশ্চয় দেখেছেন অনেক বার, আবার দেখতে অনুরোধ করছি)— সেখানে দেখবেন যে, ‘ইউনিভার্সিটি’ বলতে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩’ কী বোঝায়। ‘ইউনিভার্সিটি’ বলতে বোঝায় একটা কর্পোরেট বডি [‘বডি কর্পোরেট’]— আইন বলছে। একটা কর্পোরেট বডি— একটা সংগঠিত সংস্থা। যে-সংস্থার একটা তালিকা—সংস্থায় কারা আছেন তার একটা তালিকা—ওই আইনে ‘কর্পোরেট বডি’ কথাটার নিচে [সাথে] দেওয়া আছে। এই তালিকা [আচার্য]-উপাচার্য থেকে শুরু হয়, এবং আমি অনেক কাল ধরে যাকে বলি ‘প্রশাসনের নিম্নাঙ্গ’ সেই পর্যন্ত নেমে আসে। এইটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি।[৩] আপনি ইউনিভার্সিটি না। আমি ইউনিভার্সিটি না। ‘স্নান’ ইউনিভার্সিটি না। বাংলা বিভাগ কিংবা গণযোগাযোগ বিভাগ ইউনিভার্সিটি না। ইউনিভার্সিটি হচ্ছে প্রশাসন। যে-কয়েকজন লোক, হাতে-গোনা পনেরজন, বিশজন, পঁচিশজন, একশজন, দেড়শজন (আপনারা তালিকা বানাতে পারবেন; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে কাজ করার জন্য পয়সা পাওয়া যায়; পয়সাওয়ালা প্রশাসনিক পদের তালিকা আছে অলরেডি তৈরী-করা; আমাদের প্রশাসন-ভবনে গেলেই পাবেন; শ দেড়েক-দুয়েক লোকের তালিকা, পদের তালিকা)—এইটা হচ্ছে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’—বড় করে ধরলে। আর ঠিকঠাক মতো ধরলে,

[৩] “The Chancellor and Vice-Chancellor of the University and the members of the Senate, the Syndicate and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the University of Rajshahi.” [Section 3.2, “The University”, The Rajshahi University Act, 1973 (ACT No. XXVI of 1973)]

‘ভদ্রতা’ বজায় না রেখে ধরলে, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বাদশাহ’কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৭৩—আমি পুরনো কথাগুলোই বলছি বাধ্য হয়ে; পরিস্থিতি খুব পুরোনো—পাবলিক ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট—চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের—ঢাকা, রাজশাহী, চিটাগং, জাহাঙ্গীরনগর—এই আইনে উপাচার্যের যে-পদটা রাখা হয়েছে, এই পদটা একজন একনায়কের পদ, একটা বাদশাহর পদ। আমরা একটা ছোট গ্রামে থাকি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নামে, যেই গ্রাম জমিদারি প্রথায় চলে। বাদশাহি প্রথায় চলে। এবং গ্রামের প্রধান জমিদার যা বলবেন, যেভাবে তাকাবেন ডাইনে অথবা বামে, মুখ দিয়ে খুব বেশি কথাও বলতে হবে না, তাইতেই সেই জমিদারের শান্ত্রী-সেপাইরা, পেয়াদারা বুঝতে পারবে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কী চায়। এটা শহীদ ইকবালের মামলা না। এটা সেলিম রেজা নিউটনের মামলা না। এটা আইনগতভাবে, বৈধভাবে, আমরা আমাদের দেশের পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে চালাই তার মামলা। এই মামলার মতো করেই আমরা আমাদের গ্রামের পাঠাগারগুলো সাজাই। পাঁচজন বন্ধু মিলে একটা পাঠাগার বানাই। সেখানে একটা কনষ্টিটিউশন বানাই। সেখানে বহিষ্কারের ব্যবস্থা রাখি। চাঁদা দিয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা রাখি। সেখানে ‘আইনশৃঙ্খলা’ থাকে। সেখানে একজন সভাপতি থাকেন। একটা ছোটখাটো রাষ্ট্র। একটা ছোটখাটো জমিদারি। আধুনিক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেনেজারিয়াল জমিদারি প্রথা।

এটা শুধু বাংলাদেশে না। আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকান। ক্লাসিক্যাল ক্যাপিটালিজম এখানে নাই। এখানে কী আছে? এখানে বিশাল বিশাল কর্পোরেট বডি আছে। বিশাল বিশাল বুরোক্রেসি আছে। আজকের যে আমেরিকান ক্যাপিটালিজম সেই ক্যাপিটালিজমের বড় বড় ব্যবসায়িক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো একেকটা বিশাল বুরোক্রেসি। প্রাচীন কালের,

ক্লাসিক্যাল ক্যাপিটালিজমের, যে-মালিকরা ছিলেন, যে-উদ্যোক্তারা ছিলেন, সেই উদ্যোক্তারা ছিলেন সাহসী, ডেসপারেট। তাঁরা ঝুঁকি নিতেন। তাঁরা নতুন নতুন উদ্যোগ নিতেন। তাঁরা এমন সমস্ত প্রোডাক্ট বানাতেন যে-সমস্ত প্রোডাক্ট মার্কেটে চলবে কিনা তার ঠিক নাই। অনেক প্রোডাক্ট চলত না। অনেক ক্যাপিটালিস্ট ভেঞ্চার মার খেত। অনেকগুলো চলত, দাঁড়িয়ে যেতো। সেই ঝুঁকি-নেওয়া ইন্ডিভিজুয়াল, স্বাধীন ও ডেসপারেট ইন্ডিভিজুয়াল আজকের এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল-ম্যানেজারিয়াল অ্যামেরিকান ক্যাপিটালিজমে নাই। এটা নিও ফিউডাল ক্যাপিটালিজম। নতুন সামন্ত জমিদারি প্রথামূলক পুঁজিবাদ। যেখানে মাঝখানের আমলারা, কেরানিরা, তাঁরাই হচ্ছেন এই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর চালক।

আমাদের এখানে [বাংলাদেশে] পুঁজিবাদি প্রতিষ্ঠান-ত্রটিষ্ঠানের বালাই-ই নাই। আমাদের এখানে সবই রাষ্ট্র। আমাদের গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। আমাদের গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে যে, এখানে জমিদারি প্রথা চলবে। বাংলাদেশ হলো সেই দেশ যেই দেশে পয়লা বৈশাখ থেকে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত, পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাধীনতার বন্দনা করি আমরা। নানানভাবে। এবং বাংলাদেশ সেই দেশ যেখানে কোনো ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীনতার সামান্যতম ছিঁটেফোটাও যদি আমরা দেখি আচারে-আচরণে, চুলে কেশবিন্যাসে পোশাকে আশাকে আমরা ছি ছি ছি ছি ছি ছি করতে থাকি। এটা হচ্ছে আমদের স্বাধীন জমিদারি প্রথা।

মানুষের বিরুদ্ধে দোষ দিয়ে, ‘এই সিস্টেম খারাপ’ এই কথা বার বার বলে, কোনো ফায়দা হয় না। আমরা নিজেরা আসলে কী চাই? আমরা নিজেরা আমাদেরকে কী ভূমিকায় দেখতে চাই? কেমন মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদেরকে কল্পনা করি। নিজেদেরকে নিয়ে নিজেরা আমরা কি কোনো স্বপ্ন দেখি? সেই স্বপ্নের ভেতরে কী রকম মানুষ হিসেবে আমাকে দেখা যায়? নিজের স্বপ্নের ভিতরে? এইটা হচ্ছে প্রশ্ন।

যে-তথাকথিত মৌলবাদীদের, যে-তথাকথিত ধর্মান্ধদের, যে-তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল মানুষদের আমরা সারাক্ষণই নিন্দা করি, 'অশুভ শক্তি' বলে আখ্যায়িত করি এবং তার বিরুদ্ধে আমরা পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগকারী বাহিনীগুলোকে নিয়ে একসাথে লড়াই করতে চাই— সেই সমস্ত শক্তির বৈশিষ্ট্য কী? চিন্তাহীন, যুক্তিহীন, স্বাধীনতাহীন, আত্মমর্যাদাহীন অনুসরণ। মালগাড়ির মতো করে চলা। 'ব্যান্ডওয়াগন পলিসি'র মতো করে চলা। সামনে ইঞ্জিন চলবে, পেছনে ট্রেন চলবে। একটা চাবি মেরে ছেড়ে দেবে, ঘড়ি ঘুরতে থাকবে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকবে। কী সুন্দর বিজ্ঞান! এই যে বিজ্ঞান, এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান *আমরা* চর্চা করি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই বিজ্ঞান আমরা ক্লাসরুমে চর্চা করি। এখানে। আমাদের পরীক্ষার মধ্যে চর্চা করি। মুখস্থ, পূর্বনির্ধারিত প্রশ্ন থাকে, মুখস্থ পূর্বনির্ধারিত 'বমি' আমরা খাতার মধ্যে উৎপাদন করি। এই চিন্তাহীনতার, আত্মমর্যাদাবোধহীনতার যে-সংস্কৃতি আমরা দাঁড় করিয়েছি এরই নাম আমরা দিয়েছি 'ছোটকাগজ'। এরই নাম আমরা দিয়েছি 'স্বাধীনতা'। এরই নাম আমরা দিয়েছি 'মুক্তিযুদ্ধ'। এরই নাম আমরা দিয়েছি 'নতুন ধারার', 'বিকল্প ধারার' চলচ্চিত্র। নামে কিছু যায়-আসে না। আমরা প্যারেড করছি। এইটুকু আমরা যদি খেয়াল রাখি যে: ঘাড়ের উপরে নিজের মাথাকে 'প্রধান' হিসেবে গণ্য না-করে আর-কাউকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'প্রধান' বলে গণ্য করতে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত কথা সুন্দর সুন্দর কথা হয়ে থাকবে।

আমি এই আয়োজনকে নিন্দা করার জন্য কিংবা এই আয়োজনের অসারতা প্রমাণ করার জন্য এখানে আসি নি। তাই যদি আমি আসতাম তাহলে আমি এই কাজ করতেই থাকতাম। আমি এই ক্যাম্পাসের 'বাজারমূল্যওয়ালা' বক্তাদেরই একজন হিসেবে দীর্ঘকাল ধরেই আছি [হাসি]। ছিলাম। থাকব না।

এই দেশে নাম কামানো খুব সহজ। একটু প্যারেড করতে হয়। একটু পেছনে পেছনে হাঁটতে হয়। এই দেশে নাম বিসর্জন দেওয়া খুব কঠিন। কিছুতেই আপনি নাম বিসর্জন দিতে পারবেন না। আপনার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, ভক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে। ভক্তি। মূর্তিমান ভক্তি। সেই ভক্তিরা আপনার নামকে ভক্তি করতে থাকবে। আপনাকে নাম বিসর্জন করতে দিতে দিবে না। আমাদের আর নাম প্রয়োজন নাই। কোনো কাজের, কোনো প্রতিষ্ঠানের, কোনো ব্যক্তির — আমাদের আর নিজেদের নাম প্রয়োজন নাই। চলেন দেখি, আমরা নামহীন গোত্রহীন হতে পারি কিনা। আমরা পাল থেকে, গোত্র থেকে, বেরিয়ে আসতে পারি কিনা। আমরা নিজের দুই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে পাশে আরও একজন যে নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সাথে হাত মেলাতে পারি কিনা। এইটা হচ্ছে আমাদের চিন্তার জায়গা।

আপনারা 'স্নান'— আপনাদের মতো আরও অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে কোনো ভালো কিছু নাই তা না। সবচাইতে বেশি যে-ভালো জিনিসটা আছে, সেটা হলো এখানে তাজা মানুষ আছেন যাঁরা এখনও আমলা হন নি। যাঁরা এখনও চাকরি পান নি। যাঁরা এখনও পদে পরিণত হন নি। পদ মানে জানেন তো? পোস্ট; আবার পদ মানে পা। যাঁরা পায়ে পরিণত হন নি। যাঁদের এখনও চোখ আছে। যাঁদের এখনও স্বপ্ন আছে। যাঁরা এখনও এখানে অপ্রয়োজনে চিৎকার করতে পারেন। হৈচৈ করতে পারেন। আড্ডা মারতে পারেন। মেলা কাল থেকেই আমি বলি: বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ক্লাসরুমের বাইরে। আমরা ক্লাসরুমের বাইরেটাকেও নতুন করে বৃহত্তর ক্লাসরুম যেন না-বানাই।

এই কথাগুলো বলা ছাড়া আমার সামনে কোনোই গতি নাই। কোনোই গতি নাই। বাকি জীবন ধরে সম্ভবত আমাকে নিত্যনতুন নিন্দুকের তালিকা বড় করতে হবে। বাকি জীবন ধরে আমাকে

সম্ভবত প্রচুর মানুষকে, প্রচুর বন্ধুকে, আমার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের তো আর কোনো উপায় থাকবে না— এই কাজ করা ছাড়া। কিন্তু আমি জানি — এই যে আপনারা যাঁরা গান করছেন, আপনারা যাঁরা গিটার বাজাচ্ছেন, আপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা আমারই মতো ইয়াবা-চক্রের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এইরকম অজস্র ক্লাসরুম-বহির্ভূত মানুষের তাজা বাচ্চা যাঁরা এখনও—আমি আবার বলছি—আমলা হয়ে ওঠেন নি, পদ হয়ে ওঠেন নি, তাঁরাই আমাদের ভবিষ্যতের জায়গা।

আমি জানি, আপনাদের মধ্যে সবাই সব কিছু পছন্দ করে নিয়ে মেনে নেন না। যা কিছু আপনাদেরকে করতে হয় সবই যে আপনারা মহা আনন্দে এবং কিছুই না বুঝে করেন তা না। আপনাদেরকে বুঝতে হয়। আপনারা জেনে গেছেন। আপনারা এই সমস্ত 'বাধ্যতামূলক' জানার বাইরে যদি আরও কিছু জানার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনাদের মতো—আপনাদের চাইতেও অল্প বয়সের—যে-ছেলেমেয়েরা খুব অল্প সংখ্যায়, ১৯৭১ সালে, অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়িয়েছিল, অনির্ধারিত জীবন এবং ঠিকানাহীন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিল তাদের সঙ্গে, কিংবা [অধ্যাপক] আরকেএস-এর সঙ্গে, কিংবা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক [শফিউল ইসলাম] লিলনের সঙ্গে, কিংবা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক ছেলেমেয়ে যাদের আমরা বার বার করে রক্ত দিতে দেখেছি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হওয়াটাই তো আসল ব্যাপার, তাই না? পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়া। সত্যিকারের জীবিতদের সঙ্গে এবং সত্যিকারের মৃতদের সঙ্গে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে এই এতক্ষণ ধরে যে শুনলেন, রাগ করলেন না, ক্ষেপে গেলেন না, প্রতিবাদ করলেন না— তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সহ্য করার জন্য। গত বছর পনের-বিশেক ধরে আমাকে এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্যে

দিয়েও যেতে হয়েছে যেখানে রাজশাহী থেকে অনেক দূরে আমাকে ডেকে নিয়ে, আমন্ত্রণ করে, অতিথি বানিয়ে ... যেমন ধরেন যশোরে চে গুয়েভারার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত বিরাট অনুষ্ঠানে একমাত্র বক্তা হিসেবে আমাকে উনারা রেখেছিলেন কী মনে করে আল্লাহ্পাক জানেন। তার পর সেখানে দশ মিনিট কথা বলার আগেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অত্যন্ত বর্ষীয়ান সম্পাদক-নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, আমরা এসব শুনতে আসি নি এখানে। তাতে আমার আনন্দ বাড়ে। আমি বুঝতে পারি যে, কথা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। কথা এখনও খুব ভয়ংকর শক্তিশালী। সমস্ত মুখস্থ কথার মধ্যেও সামান্য কয়েকটা কথা অনেক 'ঝামেলা' তৈরি করতে পারে। আমাদের 'ঝামেলা দরকার'। এই নিপাট, নিঃশব্দ, সুন্দর, উন্নয়নশীল, একনায়কত্বের মধ্যে আমাদের কিছু 'ঝামেলা' তৈরি করতে হবে।

আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

স্নান-বক্তৃতা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭শে মার্চ ২০১৮
অডিও রেকর্ডের অনুলিপি: 'স্নান' কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, কথক কর্তৃক পরিমার্জিত
প্রকাশ: স্নান, ৪৬তম সংখ্যা, ২৫শে জুলাই ২০১৮, রাবি